প্রথম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়

ভৌগোলিক পরিচয় ঃ

পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম ক্ষুদ্র অংশ হল উত্তরবঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে 'উত্তরবঙ্গ' নামে কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূ-খণ্ডের উল্লেখ নেই ভারতের জাতীয় মানচিত্রে। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ আমল থেকেই লোকমুখে 'উত্তরবঙ্গ' নামটি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এই উত্তরবঙ্গ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ড. নির্মল দাশ বলেছেন, " 'উত্তরবঙ্গ' বললে এখন সাধারণভাবে দেশের যে-এলাকাকে আমরা বুঝি, সুদূর অতীতে তো বটেই, এমনকি অদূর অতীতেও সেই এলাকার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রাজশক্তির অধীনে ছিল। সম্ভবত উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ইংরেজের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গার উত্তরে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমের সমতল এলাকায় একটি অখণ্ড রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন ভৌগোলিক এলাকার সম্ভাবনা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। শুধু সমতল এলাকাতেই নয়, ইংরেজের আত্মপ্রসারশীল উদ্যোগেই সিকিম ও ভুটানের মত সংলগ্ন পার্বত্য এলাকারও কিছু কিছু অংশ ক্রমে এই নিরবচ্ছিন্ন ব্রিটিশ শাসনকর্তৃত্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে মূলত ব্রিটিশ আমলেই সমতল ও পার্বত্য এলাকা-সমন্বিত বর্তমান উত্তরবঙ্গের একটা ভৌগোলিক প্রাক্‌রূপ প্রথম আভাসিত হয়ে ওঠে।"[১] পরবর্তীকালে প্রশাসনিক সুবিধার্থে বিভিন্ন সময়ে এই ভৌগোলিক এলাকার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদী গঙ্গার উত্তরদিকের অংশটিকেই বলা হয় উত্তরবঙ্গ। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ এই ছয়টি জেলা একত্রে 'উত্তরবঙ্গ' নামে পরিচিত। প্রশাসনিক দিক থেকে এই ছয়টি জেলার সরকারি নাম 'জলপাইগুড়ি ডিভিশন' হলেও, কিন্তু এই প্রশাসনিক নামটি সরকারি নথিপত্রে কেবল লিখিত ভাবেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, মৌখিকভাবে এর নাম বাংলায় 'উত্তরবঙ্গ' এবং ইংরেজিতে 'নর্থবেঙ্গল'।[২]

ভূ-প্রকৃতিগত দিক দিয়ে উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়ি ডিভিশনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ক. উত্তরের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, খ. তরাই অঞ্চল, গ. উত্তরের সমভূমি অঞ্চল। শিলিগুড়ি মহকুমা বাদে প্রায় সমগ্র দার্জিলিং জেলা ও জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত উত্তরের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চল পর্বতময় হওয়ায় বন্ধুর। দার্জিলিং জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ও জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশ জুড়ে রয়েছে তরাই অঞ্চল। 'তরাই' নামটি এসেছে ফার্সি শব্দ থেকে, যার অর্থ স্যাঁতস্যাতে ভাব। এছাড়া জলপাইগুড়ির

অধিকাংশ অংশ, সমগ্র কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলা উত্তরের সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। হিমালয় থেকে নেমে আসা নদীগুলির পলি সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই অঞ্চল। উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতির মতো জলবায়ুর তারতম্যও লক্ষণীয়। গ্রীষ্মকালে কোন কোন অঞ্চলের গড় উষ্ণতা ৩০-৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট হয়ে থাকে। আবার শীতকালে পার্বত্য অঞ্চলে মাঝেমাঝেই তুষারপাত হয় এবং বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে অবিরাম বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রচুর নদ-নদী প্রবাহিত হয়েছে। হিমালয়ের বরফগলা জলে পুষ্ট হওয়ায় সারাবছরই এই নদীগুলিতে জল থাকে। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল পেয়ে এই নদীগুলি ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে এবং প্লাবনের আশঙ্কা দেখা দেয়। খরস্রোতা হওয়ায় নদীগুলি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে উপযুক্ত। উত্তরবঙ্গের প্রধান প্রধান নদীগুলি হল তিস্তা, জলঢাকা, তোর্ষা, মহানন্দা, কালিন্দী, পুনর্ভবা, কালজানি, আত্রাই, রায়ডাক প্রভৃতি।

কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলের অন্যতম ফসল হল ধান ও পাট। এছাড়া গম, আখ, তিল, সরিষা, চা, তুঁত, রেশমকীট, ডাল প্রভৃতি শষ্য চাষ করা হয়। দার্জিলিং-এর চা জগদ্বিখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৮০ ভাগ রেশম মালদহ জেলায় উৎপাদন হয়। জলবায়ু অনুকূল হওয়ায় আর্দ্র ও শুষ্ক চিরহরিৎ এবং আর্দ্র পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য রয়েছে উত্তরবঙ্গে। এখানকার প্রধান প্রধান বৃক্ষগুলি হল - শাল, সেগুন, শিশু, শিমুল, শিরিষ, বট, অশ্বত্থ, বাঁশ, বেত প্রভৃতি। খনিজ সম্পদের অভাব, শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত জমির অপ্রতুলতা, অনুন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের শিল্পে অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। তবে কোথাও কোথাও চা, কাঠ, রেশম ও পর্যটনশিল্প গড়ে উঠেছে।

উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়ি ডিভিশনের মোট আয়তন ২১, ৬২৫·০ বর্গ কিমি। এর মধ্যে দার্জিলিং ৩,১৪৯·০ বর্গ কিমি, জলপাইগুড়ি ৬,২২৭·০ বর্গ কিমি, কোচবিহার ৩,৩৮৭·০ বর্গ কিমি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর যথাক্রমে ৩,১৪০·০ বর্গ কিমি ও ২,২১৯·০ বর্গ কিমি এবং মালদহ ৩,৭৩৩·০ বর্গ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ১,৪৭,২৪,৯৪০ জন। ক্রমাগত জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৭২,০৪,২৩৯ জন।

জেলা	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী
কোচবিহার	২৮২২৭৮০	১৪৫৩৫৯০.	১৩৬৯১৯০
জলপাইগুড়ি	৩৮৬৯৬৭৫	১৯৮০০৬৮	১৮৮৯৬০৭
দার্জিলিং	১৮৪২০৩৪	৯৩৪৭৯৬	৯০৭২৩৮
উত্তর দিনাজপুর	৩০০০৮৪৯	১৫৫০২১৯	১৪৫০৬৩০
দক্ষিণ দিনাজপুর	১৬৭০৯৩১	৮৫৫১০৪	৮১৫৮২৭
মালদহ	৩৯৯৭৯৭০	২০৬১৫৯৩	১৯৩৬৩৭৭

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জাতি ও জনজাতির লোক পাশাপাশি বাস করে। এদের মধ্যে অন্যতম হল বাঙালি, রাজবংশী, মেচ, ওরাও, মুসলমান, লোধা, নেপালি, ভুটিয়া, গোর্খা, টোটো প্রভৃতি জাতি-জনজাতি।

উত্তরবঙ্গের উত্তরে রয়েছে সিকিম রাজ্য ও ভুটান দেশ, পশ্চিমে বিহার রাজ্য ও দেশ নেপাল, পূর্বে অসম রাজ্য, দক্ষিণে গঙ্গানদী এবং দক্ষিণ-পূর্বে বাংলাদেশ। এই অঞ্চলের পরিবহন ব্যবস্থা ততটা উন্নত না হলেও এই অঞ্চলের উপর দিয়ে গিয়েছে ৩১ ও ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। এছাড়া পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ এবং বাগডোগরা বিমান বন্দরের মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করা হয়। ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ফলে উত্তরবঙ্গের সাথে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক সীমারেখা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ছিল। মহাস্থানগড়ের এক শিলালিপি অনুযায়ী জানা যায় যে উত্তরবাংলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এবং খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত বাংলা গুপ্তরাজগণের অধীন ছিল। ৬৩৮ খ্রিঃ চৈনিক পরিব্রাজক উয়াং চুয়াং এদেশে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ড. নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য, তিনি বলেছিলেন— "য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ ভ্রমণ-ব্যপদেশে পুণ্ড্রবর্ধনেও আসিয়াছিলেন। তখন এই দেশে সমৃদ্ধ জনবহুল, প্রতি জনপদে দীঘি, আরামকানন, পুষ্পোদ্যান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; ভূমি সমতল এবং জলীয় শস্যসম্ভার সুপ্রচুর, জলবায়ু মৃদু।"[৩] য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ সে সময় বাংলাকে পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত দেখেছিলেন। যথা— কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত ও সমতট। এ থেকে অনুমান করা যায় যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর থেকে সুদৃঢ় রাজশক্তির অভাবে বঙ্গদেশ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড়, কামরূপ, কোচ, বৈকুণ্ঠপুর প্রভৃতি রাজতন্ত্রগুলি উত্তরবঙ্গের শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। আর প্রতিটি রাজবংশ যে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল এতে সন্দেহ নেই। কোনো কোনো সময় দেখা গেছে, এই উত্তরবঙ্গ সমগ্র বঙ্গদেশের চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে গৌড়ীয় শাসনের কথা, যা বৃহৎ বঙ্গদেশকে একসময় পরিচালিত করেছিল।

ঐতিহাসিকদের মতে, প্রাক্-আর্য ভারতে উত্তরবঙ্গের 'পুণ্ড্রবর্ধন' ছিল একটি অন্যতম শক্তিশালী রাজতন্ত্র। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে, পুণ্ড্র উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান জাতি। ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে এই পুণ্ড্ররাজ্য ও পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ রয়েছে। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, "মোটামুটি সমস্ত উত্তরবঙ্গই বোধহয় ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অধীন, একেবারে রাজমহল-গঙ্গা-ভাগীরথী তীর হইতে আরম্ভ করিয়া করতোয়া পর্যন্ত।"[৪] এর কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন, য়ুয়ান্-চোয়াঙ কজঙ্গল থেকে পুণ্ড্রবর্ধন এসেছিলেন এবং করতোয়া পার করে গিয়েছিলেন কামরূপ। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, "কজঙ্গল এবং করতোয়া-মধ্যবর্তী ভূ-ভাগই তাহা হইলে পুণ্ড্রবর্ধন;"[৫] সুতরাং করতোয়া ও গঙ্গার মধ্যবর্তী প্রাচীন স্থানের নাম 'পুণ্ড্র' বলা যেতে পারে।

পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রবর্ধন নগর। 'গৌড়ের ইতিহাস'-এ আমরা পাই "এই নগরের বর্তমান নাম পাণ্ডুয়া বা স্থানীয় ভাষায় পাঁড়ুয়া। মালদহ জেলায় ইহার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধনকে কেহ কেহ বগুড়া জেলার মহাস্থান গড় বলিয়া নির্ণয় করেন।"[৬] জৈনদের কল্পসূত্রে খ্রিস্টপূর্ব বহু শতাব্দী আগে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কাছে পুন্ডরীক নামে বণিক শাখার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মালদহ থেকে বগুড়া পর্যন্ত এক বিশাল এলাকায় একসময় প্রচুর রেশম উৎপাদন হত। এই রেশম উৎপাদনের কাজে যুক্ত লোকেদের সে সময় পুণ্ড্ররীক বলা হত। তবে এই পুণ্ড্ররীকদের অন্তর্গত বেশিরভাগ মানুষ পরবর্তীতে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত এবং চাষবাসের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'গৌড়ের ইতিহাস' সম্পাদনাকালে ভূমিকা অংশে ড. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য দীনেশচন্দ্র সরকারের 'শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ' গ্রন্থটিকে অনুসরণ করে দেখিয়েছেন যে মহাস্থানগড়ে অর্থাৎ বাংলাদেশের অন্তর্গত বগুড়া জেলায় মৌর্যব্রাহ্মী লিপিখণ্ডের উদ্ধার এবং কলুইকুড়ি সুলতানপুর তাম্রশাসনের আবিষ্কার হওয়ার পর এটি প্রমাণিত হয়েছে যে পুণ্ড্রনগর মহাস্থানগড়েই অবস্থিত ছিল।[৭] আবার রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে হোয়েন সাঙ-এর পুণ্ড্রবর্ধনে আগমনের কিছুকাল আগে রাজা শশাঙ্ক বা নরেন্দ্র গুপ্ত ছিলেন গৌড় ও পুণ্ড্ররাজ্যের অধিপতি। এরপর পালবংশ পুণ্ড্রবর্ধন অধিকার করলে শূরবংশীয়রা দক্ষিণে চলে যান। পালবংশের পর গৌড় অধিকার করেন সেনবংশ। তবে এ সমস্ত তথ্য নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। সে সময় পুণ্ড্রবর্ধন অঞ্চলটি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বা পৌণ্ড্রভুক্তি নামে পরিচিত হয়েছিল।

W.W. Hunter-এর মতে নীলধ্বজ নামে কোন এক ব্যক্তি পালবংশীয় শেষ রাজাকে পরাজিত করে কামরূপের সিংহাসন অধিকার করেন। কথিত আছে উনিই মিথিলা থেকে ব্রাহ্মণ নিয়ে এসে কামরূপে স্থাপন করেন। 'আসাম বুরুঞ্জি' ও অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থকে অনুসরণ করে বলা যায় যে রাজা নীলধ্বজের পরে চক্রধ্বজ ও তারপরে নীলাম্বর রাজা হন। বুকানন হ্যামিল্টনকে অনুসরণ করে W.W. Hunter জানিয়েছেন, "It is there stated that Raja Nilambhar of Kamatapur (now a ruin within the present state of Kuch Behar) was the last independent Hindu rular of the country; and that, after his defeat and capture by Husain shah, one of the Afghan Kings of Gour, in the beginning of the sixteenth century, anarchy prevailed for several years, and the land was overrun by wild tribes from the North-east."[৮] এদের মধ্যে কোচ জনজাতি ছিল খুব শক্তিশালী। কামতাপুর রাজ্যের অরাজকতার সুযোগে কোচজাতীয় হাজো নামে এক ব্যক্তি কামরূপের কাছাকাছি তাঁর রাজত্ব স্থাপন করেন। যোগিনীতন্ত্রে এদের 'কুবাচ' বলা হয়েছে। সম্ভবত এরা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বাংলায় প্রবেশ করে। তিনি কোচ ও মেচ জাতির ঐক্যসাধনের জন্য কোচ দলপতি হাড়িয়ার সাথে নিজের দুই মেয়ে হীরা ও জীরার বিয়ে দেন। কথিত আছে হীরার গর্ভে বিশ্বসিংহ ও জীরার গর্ভে শিশুসিংহের জন্ম হয়। তবে এ বিষয়ে মতান্তর লক্ষ করা যায়। পরবর্তীকালে বিশ্বসিংহ নিজের বাহুবলে সম্পূর্ণ কামরূপ জয় করে রাজ্য বৃদ্ধি করেন। এরপর শিশুসিংহকে রায়কত অর্থাৎ মন্ত্রীপদ প্রদান করে বৈকুণ্ঠপুরের রাজত্ব প্রদান করেন। মেজর ফ্রান্সিস জেনকিংস-এর মতে বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ পূর্বদিকে অসমের তলদেশ, দিনাজপুরের বৃহত্তর অংশ, রঙপুর এবং সম্পূর্ণ কামরূপ পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

এদিকে বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতেরা বংশধারা অনুযায়ী কামরূপের মহারাজাকে বার্ষিক নজরানা দিতেন এবং অভিষেকের সময় রাজছত্র ধারণ করতেন। কিন্তু অষ্টম রাজা মহীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর যখন ন্যায্য উত্তরাধিকারীর সিংহাসন লাভে বাধা আসছিল, ঠিক সেই সময় ভুজ দেও ও জগ দেও কামরূপের সিংহাসন দখল করার চেষ্টা করে বলে জেনকিংসের লেখা থেকে জানা যায়। তবে রূপনারায়ণের কাছে তারা পরাজিত হয়। কিন্তু রায়কতদের মনে কোচবিহারের রাজত্ব লাভ করার যে আকাঙ্খা জন্মেছিল তা বিশেষভাবে প্রকাশ পায় রায়কত দর্পদেবের সময়ে। এরপর ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাথে চুক্তি করে করদমিত্র রাজ্যে পরিণত হয় কোচবিহার। এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বৈকুণ্ঠপুরের রাজাদের জমিদার হিসেবে ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে আনুমানিক ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণে কোচবিহারের সাথে রায়কতদের অবশিষ্ট সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়।[৯] অবশেষে বৈকুণ্ঠপুর এবং ডুয়ার্স অঞ্চল নিয়ে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জলপাইগুড়ি জেলার সৃষ্টি হয়।

তৎকালীন বৃহৎ বঙ্গদেশে পাল ও সেন বংশের পতনের পর মুসলিম রাজত্ব শুরু হয়। কথিত আছে রাজা গণেশ মুসলিমদের হাত থেকে বাংলার সিংহাসন দখল করেন। অনেকের ধারণা রাজা গণেশের উপাধি 'দনুজমর্দন দেব' থেকেই দিনাজপুর নামের উৎপত্তি হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন ১৪১৬-১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে দনুজমর্দন দেব নামে বাংলায় একজন হিন্দু রাজা ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "The name of the North Bengal district of Dinajpur, given as Dinawj or Danoj (Danuj) in persain histories, unquestionably preserves his name : a large principality thus came to be associated with him, and the people have remembered him in this way."[১০] আবার উত্তরবঙ্গের অন্যতম জেলা দার্জিলিঙের প্রাচীন নাম ছিল 'দর্জেলামা'। কথিত আছে, দর্জে নামে একজন অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লামার নামে এই নামকরণ হয়েছিল।[১১] এখনকার দার্জিলিং জেলা দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা— পার্বতীয় অংশ ও পর্বততল অর্থাৎ মোরঙ বা তরাই অঞ্চল। যা একসময় সিকিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে সিকিম ও নেপালের সীমানা নিয়ে যুদ্ধ বাধলে সিকিমরাজ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেই অনুযায়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সিকিমের পক্ষ নেয়। ইংরেজদের হাতে নেপালের গুর্খা (গোর্খা) সৈন্য পরাজিত হলে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে নেপাল সন্ধি করতে বাধ্য হয়। সন্ধির শর্তানুসারে মোরঙ অঞ্চল ব্রিটিশ অধিকৃত হয়। তবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ মোরঙ বা তরাই অঞ্চল সিকিম রাজার হাতে তুলে দেন।[১২] এর কয়েক বছর পর দার্জিলিং-এর সৌন্দর্য ও মনোরম আবহাওয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সিকিমরাজের কাছে দার্জিলিং দাবি করেন। প্রথমদিকে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে সিকিমের মহারাজা ব্রিটিশদের হাতে দার্জিলিং প্রদেশ সমর্পন করেন।[১৩] এদিকে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে নেপালের কাছ থেকে বালাসন ও ছোট রঙ্গিতের পশ্চিম ও মেচী নদীর পূর্ব পর্যন্ত ভূখণ্ড ব্রিটিশরা লাভ করেন।[১৪] ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ডাঃ ক্যাম্বেল

দার্জিলিঙের সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন। দার্জিলিঙের পরিবর্তে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সিকিমের রাজাকে বার্ষিক তিন হাজার টাকা কর দিতে শুরু করেন। এরপর ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ভুটান থেকে প্রাপ্ত বর্তমান কালিম্পং মহকুমা দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।[১৫] বিশ্বের বাজারে ইউরোপের অভিজাত শ্রেণির কাছে বাংলার মসলিনের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ইউরোপীয়ান কোম্পানীগুলি নতুন বাজার খুঁজতে মালদহে এসে উপস্থিত হয়েছিল। এরপর ১৯৪৭ সালে রাজনৈতিক নানা উত্থান-পতনের পর ভারতের স্বাধীনতা আসে দ্বিখণ্ডিত হয়ে। প্রথমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মালদহ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। অবশেষে তিন দিনের রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার পর জেলার ১৫ টির মধ্যে ১০ টি থানাসহ মালদহ জেলা ভারতের সাথে যুক্ত হয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্য ভারত ইউনিয়নের বাইরে ছিল। ১৯৪৯ সালে কোচবিহারের কোচ রাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর এক চুক্তির দ্বারা কোচবিহার রাজ্যের শাসনভার ভারত ইউনিয়নের হাতে তুলে দেন। আর তখন থেকেই কোচবিহার রাজ্যে কোচ রাজতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়। এরপর স্বাধীনতা অর্জনের অনেক পরে ১৯৯২ সালে দিনাজপুর জেলাকে প্রশাসনিক সুবিধার্থে দুটি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে, যথা— উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর।

স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে যখন সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল, সেই ঝড়ের ঝাপটা উত্তরবঙ্গে কিছুটা হলেও এসে লেগেছিল। কিন্তু কোচবিহারের ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ তা মূলেই কঠোরভাবে দমন করেন। পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলন ও অনুশীলন সমিতি উত্তরবঙ্গের সব এলাকাতে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে কোচবিহার রাজ্যও বাদ পড়েনি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন উত্তরবঙ্গের জনমানসকে যে প্রভাবিত করেছিল, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে অহিংস-অসহযোগ ও ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে। ইংরেজদের কঠোর দমননীতি এই অঞ্চলের বহু দেশপ্রেমিকের কণ্ঠরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই উত্তরবঙ্গ নানাভাবে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। আর এর ফলেই একের পর এক নানা গণ আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটেছে এ অঞ্চলে। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম হল তেভাগা আন্দোলন, তিনবিঘা ও বেরুবাড়ি আন্দোলন, নক্‌শাল আন্দোলন, উতজাআস আন্দোলন, কামতাপুর আন্দোলন, গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন প্রভৃতি। দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, বঞ্চনা, হতাশার ফল এই আন্দোলনগুলি। কিন্তু ইতিহাস তো থেমে থাকে না, চলমানতাই তার ধর্ম। তাই এক একটি মূল্যবান ঘটনা সময়ের স্রোতে একসময় ভেসে ওঠে, আবার পরক্ষণেই অতলে ডুবে যায়। তবে এসব ঘটনা যে দীর্ঘস্থায়ী ফল রেখে যায়, তা তার পারিপার্শ্বিক সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে পরিবর্তিত করে। অন্যভাবে বলা যায় উত্তরবঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পেছনে এ সমস্ত গণ আন্দোলনগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ

ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকের অঞ্চলগুলির সামাজিক কাঠামো বিশেষ ধরনের, যা আর্যাবর্ত থেকে আলাদা। আর এই সমাজের মূল চালিকাশক্তি ছিল ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠী। সেই জনগোষ্ঠী, যাকে আর্যরা তাঁদের সাহিত্যে 'কিরাত' নাম দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গেও মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে।

ভারতে অন্যত্র যখন বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সময় উত্তরবঙ্গকে পুরোপুরিভাবে কোন বিদেশী শক্তি জয় করতে পারেনি। এই অঞ্চলের লোকেদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল। তবে সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা পরবর্তীকালে অর্থাৎ ইংরেজ শাসনকালে আর লক্ষ করা যায়নি। এর কারণ হিসেবে সমাজতান্ত্রিকদের ধারণা সেই সময় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রচার এই অঞ্চলের লোকেদের মনে বীররস অপেক্ষা চৈতন্যের প্রেমবাদ স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। ফলে তাদের মধ্যে সেই 'Spirit' নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর এই ধর্ম সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর মধ্যে। তাই এর ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই উত্তরবঙ্গের সামাজিক কাঠামোতে বর্ণভেদ প্রথা কোন কালেই তেমন প্রচলিত ছিল না, বর্তমানেও নেই। আবার এর পাশাপাশি একথাও সত্য যে, হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য প্রথা এই অঞ্চলের অনেক প্রথাকে প্রভাবিত করলেও বর্ণাশ্রমহীন প্রথাকে তেমন প্রভাবিত করতে পারে নি। আর এক্ষেত্রে অর্থাৎ সামাজিক গণতন্ত্রের বীজ বপনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধ। ঐতিহাসিকদের ধারণা তিনি নিজে মঙ্গোলয়েড ছিলেন বলেই হয়তো মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত দেশে বা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই অঞ্চলে যেহেতু মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য, তাই এখানে নারীর মর্যাদা বিশেষভাবে স্বীকৃত, যা মাতৃতান্ত্রিকতারই প্রমাণ।

ব্রিটিশরা এ অঞ্চলে আসার আগে এটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর। ম্যালেরিয়া, কলেরা, জ্বর প্রভৃতি রোগ ছিল এখানকার মানুষের নিত্যসঙ্গী। ইংরেজরা এই কারণে উত্তরবঙ্গকে যমপুরীর মতো ভয় করতেন।[১৬] তাই যে সমস্ত পরিব্রাজকেরা এই অঞ্চলে এসেছিলেন প্রত্যেকেই একে আপাদমস্তক জঙ্গলে ঘেরা বলে বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৮৩০ সালে ডেপুটি সারভেয়ার জেনারেল ক্যাপ্টেন হারবার্ট, ১৮৩৭ সালে ক্যাপ্টেন লয়েড, ১৮৪৮ সালে স্যার হুকার প্রমুখ ইংরেজ পণ্ডিতগণ। ইংরেজরা এই অঞ্চলটি অধিগ্রহণ করে এখানকার সুবিশাল অরণ্যভূমিকে চাষযোগ্য এবং চা-বাগানের উপযুক্ত তৈরি করে রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনা করেন। আর সেই সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের জনসমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি মূলত কৃষি ও চা-বাগিচাকেন্দ্রিক। এখানকার অধিবাসীদের একটি বৃহৎ অংশ কৃষি ও চা শিল্পের সাথে যুক্ত। একদিকে ক্রমাগত জঙ্গল হ্রাস ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ঘনবসতি যেমন গড়ে উঠেছে, তেমনি প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তনও দেখা দিয়েছে। কৃষি ও চা-শিল্পকে কেন্দ্র করে গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ভিত দাঁড়িয়ে থাকলেও কৃষি ও চা-শিল্প ছাড়া ব্যবসায়ী, তাঁতি, কুম্ভকার, কামার, ছুতোর, জেলে, শিক্ষকতা, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশার সাথে যুক্ত রয়েছে এই অঞ্চলের বহু মানুষ।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এনেছে কৃষিকাজে পরিবর্তন। এসেছে লাঙলের পরিবর্তে ট্রাক্টর, উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা, জৈব সারের পরিবর্তে রাসায়নিক সার ও উন্নত মানের কীটনাশক ঔষধ। বর্তমানে প্রত্যন্ত গ্রাম ও চা-বাগানকেন্দ্রিক অঞ্চলগুলিতে রাস্তাঘাট ও শিল্পের প্রসারের ফলে পাকা রাস্তা, পাকা বাড়ি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়েছে। উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার সাথে সাথে বেড়েছে শিক্ষার প্রসার। ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে জ্ঞানের আলো। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও চাকরির ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের মানুষ আগের তুলনায় সাফল্যের সাথে অনেক এগিয়ে গেছে। আধুনিক অবসর বিনোদনের দ্রব্য যেমন - টেলিভিশন, সাউণ্ড সিস্টেম, কম্পিউটার প্রভৃতি ছোট-বড় শহরাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী লোকেদের বার্ধক্য ভাতা, ইন্দিরা আবাস যোজনা প্রভৃতি নানা ধরনের আর্থিক সহযোগিতা করা হয়ে থাকে। এর ফলে শহরাঞ্চলের মতো গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে।

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট ঃ

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা রঙ-রূপ-রস-গন্ধে পরিপূর্ণ এই উত্তরবঙ্গ। যেখানে প্রকৃতির স্নিগ্ধতাকে মুছে ফেলতে পারেনি নগর সভ্যতার যান্ত্রিকতা। এখনও পরিপূর্ণভাবে বেঁচে আছে সৃষ্টির প্রাক্-মুহূর্তের সেইসব সংস্কৃতি, যা মনকে মুগ্ধ করে, মাধুর্যে ভরিয়ে দেয়। সংস্কৃতির পরিভাষা হিসেবে Culture শব্দটি স্বীকৃত। আর Culture শব্দের মূলে রয়েছে লাতিন Cultura 'কুলতুরা' শব্দ। যা Col ধাতু থেকে এসেছে। Col অর্থে চাষ করা, কৃষ বা যত্ন করা বোঝায়। তবে Culture -এর অনুরূপ প্রতিশব্দ 'উৎকর্ষসাধন' অথবা 'উৎকর্ষ' কোনটি ব্যবহার করা চলে এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে। ড. নীহাররঞ্জন রায় 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে বলেছেন, "চর্চা যেমন সংস্কৃতির লক্ষণ, চর্যা বা আচরণও তাহাই; বরং এক হিসাবে চর্যা বা আচরণই চর্চাকে সার্থকতা দান করে, এবং উভয়ে মিলিয়া সংস্কৃতি গড়িয়া তোলে।.... দৈনন্দিন জীবনাচরণের ভিতর দিয়া এই সত্য ও সৌন্দর্যকে প্রকাশ করাই তো সংস্কৃতির মৌলিক বিকাশ।"[১৭] অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক দিকের আচরণই হল মানুষের সংস্কৃতির পরিচয়। আবার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, "সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত-সেই জন্য এর চরম রূপ কোনও এক সময়ে চিরকালের জন্য ব'লে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা আর সংস্কৃতিও গতিশীল ব্যাপার।"[১৮] এক্ষেত্রে বলা যায় প্রতিটি মানুষের জীবন, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি একটি চলমান প্রবাহ। আর এই প্রবাহ প্রতিনিয়ত গতিশীল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'গীতাঞ্জলী' কাব্যগ্রন্থের 'ভারততীর্থ' কবিতায় বলেছিলেন—

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা

দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে

সমুদ্রে হল হারা।"

বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ও সম্মিলনে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "As a matter of fact, from time immemorial peoples of different races and languages and cultures have come to India, and after an initial period of hostile contact in some cases, finally settled down for a peaceful commingling and cultural as well as racial fusion with their predecessors in the land".[১৯] সুদূর প্রাচীনকাল থেকে ভারতের অচীন মহাপথ দিয়ে অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য, নেগ্রিটো, মঙ্গোলয়েড, পার্শি, গ্রীক, শক, হুন, তুর্কী প্রভৃতি জনধারা ভারতে প্রবেশ করেছে। জলধারা বয়ে গেলে যেমন পলি রেখে যায়, তেমনি জনধারা চলে গেলে রেখে যায় ভাষা ও সংস্কৃতি। তাদের সেই ভাষা ও সংস্কৃতি ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল ধরে পুষ্ট করে চলেছে। তাই বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ফলে ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এভাবেই একসময় অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষেরা আর্য ভাষাভাষীদের সাথে মিশে উত্তর ভারতে হিন্দু জাতিতে পরিণত হয়েছিল। পরস্পরের মিলনের ফলে আর্য ও অনার্য জাতির নিজেদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছেন, "প্রাচীন অনার্য্যভাষা, অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়, স্বয়ং লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এগুলি আর্য্যভাষার প্রকৃতিকে নানা বিষয়ে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে; এবং প্রচ্ছন্নভাবে খিড়কি দরজা দিয়া বহু অনার্য্য শব্দ আর্য্যভাষায় স্থান করিয়া লইয়াছে।"[২০] এর ফলে অনার্য সভ্যতার ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতিতে অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে।

অনুরূপভাবে উত্তরবঙ্গেও বিভিন্ন জাতি-জনজাতির সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। তাই উত্তরবঙ্গকে অনেকে 'মিনি ভারতবর্ষ' অর্থাৎ ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে থাকেন। উত্তরবঙ্গেও আমরা চারটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠীর সন্ধান পাই। যথা— অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য ও ভোট-চীনীয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই অঞ্চলে ভোট-চীনীয় অর্থাৎ মঙ্গোলয়েড ভাষাগোষ্ঠীর লোকের সংখ্যা বেশি। উল্লেখ্য ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে এই মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠী একসময় অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুতভাবে সেই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি কেবলমাত্র উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব ভারতে লক্ষ করা যায়। এরা ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে এসে মধ্য ও পূর্ব নেপাল, উত্তর বিহার, উত্তর ও পূর্ববঙ্গ এবং অসমে সীমাবদ্ধ। তাই উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠীর সাথে অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। ভাষার দিক থেকে এই অঞ্চলে বাংলা ভাষা বেশি প্রাধান্য পেলেও কামরূপী (রাজবংশী), নেপালি, হিন্দি, সূর্যপুরিয়া প্রভৃতি ভাষা পাশাপাশি সমপরিমাণে চলে।

উত্তরবঙ্গের সীমানার দিকে লক্ষ করলে আমরা দেখি এটি একেবারে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তসীমায় অবস্থিত। অঞ্চলটি সবদিক থেকে বিভিন্ন দেশ ও রাজ্য দ্বারা পরিবৃত। উত্তরবঙ্গের যেসব অঞ্চল বাংলাদেশ,

নেপাল ও ভুটান রাষ্ট্রের লাগোয়া, সেই এলাকাগুলিতে এসব দেশের সংস্কৃতির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এই অঞ্চলের বিভিন্ন রাজপরিবার যেমন গৌড়, কামরূপ, বৈকুণ্ঠপুর, কোচবিহার প্রভৃতি এবং এগুলির রাজধানীগুলিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজবৃত্তিধারী মানুষ ভিন্ন দেশ থেকে এসে এখানে বসবাস করতে থাকে। কালক্রমে সেই সমস্ত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে যে সমাজ গঠিত হয়েছিল, তাতে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাষার মিলন হয়েছে। এরা বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা স্থান থেকে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে। কিন্তু দীর্ঘসময় ধরে একসাথে বসবাস করার ফলে প্রত্যেকের মধ্যেই সংস্কৃতির বিনিময় হয়েছে। আর এই বিনিময়ের ফলে উত্তরবঙ্গে এক বিচিত্র মিশ্র ভাষা ও সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছে।

এই অঞ্চলে হিন্দু ধর্মের আচরণে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষ করা যায়। এমনকি মন্দির ও গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধ প্যাগোডার ধাঁচ পরিলক্ষিত হয়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে এখানকার অধিবাসীরা হয়তো প্রথমে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং পরে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গ একসময় দীর্ঘদিন ধরে মুসলমান শাসনাধীন ছিল। এক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় পাশাপাশি অবস্থানের ফলে তাদের সংস্কৃতির মধ্যেও আদান প্রদান লক্ষ করা যায়। এই প্রসঙ্গে ড. গিরিজাশঙ্কর রায় বলেছেন, "হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়দ্বয় পাশাপাশি বসবাস করিবার ফলে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে ঐশ্লামিক কিছু ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটিতে দেখা যায় যাহা বাঙালী হিন্দুর অপরাপর শাখাগুলিতেও অল্পবিস্তর সংঘটিত হইয়াছে।"[১১] আর এর উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে সত্যপীর, মাদারপীর প্রভৃতি মুসলিম দেবতার পূজা উৎসব এবং শিরনীদান। এছাড়া এই অঞ্চলের জনমানসের মধ্যে পুরাণের দেবদেবীর পাশাপাশি বিভিন্ন লৌকিক দেবী-দেবতাও শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে স্থান পেয়েছে। যেমন - বিষহরি, ষাইটোল, মাশান, মদনকাম প্রভৃতি।

সমাজের সাথে সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই সমাজের পরিবর্তনের হাওয়া সংস্কৃতির মধ্যেও এসে পড়ে। বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত উত্তরবঙ্গের গণ আন্দোলনগুলি সমাজকে ব্যাপক প্রভাবিত করেছিল। ফলে জনজীবনে এসেছে নানা পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন এসেছে বিভিন্ন জাতি-জনজাতির লোকাচারের মধ্যেও। সভ্যতার প্রাক্-মুহূর্তে সংস্কৃতির যে রূপ ছিল সেসবের কিছু লুপ্ত হয়েছে, আবার কিছুর পরিবর্তন হয়েছে ও হচ্ছে। তাই একথা স্বীকার্য যে, উত্তরবঙ্গের জনজীবনে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সংস্কৃতিরও রদবদল লক্ষ করা যায়।

তথ্যসূত্র

১. ড. নির্মল দাশ, উত্তরবঙ্গের ভাষাপ্রসঙ্গ, পৃ. ১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৩. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃ. ১০২।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

৬. ড. মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদনা, গৌড়ের ইতিহাস - রজনীকান্ত চক্রবর্তী, পৃ. ৪২-৪৩।

৭. প্রাগুক্ত, ভূমিকা অংশ, পৃ. অনুল্লিখিত।

৮. W.W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol -X, p. 402.

৯. খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

১০. Suniti Kumar Chatterji, Kirata-Jana-Krti, P. 116.

১১. কমল চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত, দার্জিলিঙের ইতিহাস, পৃ. ১৪৬।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯.

১৩. L S S O'Malley, Bengal District Gazetteers Darjeeling, p. 21.

১৪. কমল চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত, দার্জিলিঙের ইতিহাস, পৃ. ৮১।

১৫. L S S O'Malley, Bengal District Gazetteers Darjeeling, p. 27.

১৬. কমল চৌধুরী সংকলিত ও সম্পাদিত, দার্জিলিঙের ইতিহাস, পৃ. ২৯।

১৭. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, পৃ. ৪৪১।

১৮. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, পৃ. ১১।

১৯. Suniti Kumar Chatterji, Kirata-Jana-Krti, p. 2.

২০. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, পৃ. ২৪।

২১. ড. গিরিজাশঙ্কর রায়, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির দেবদেবী ও পূজা-পার্বণ, পৃ. XXVII.